প্রবন্ধ

দ্রৌপদী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

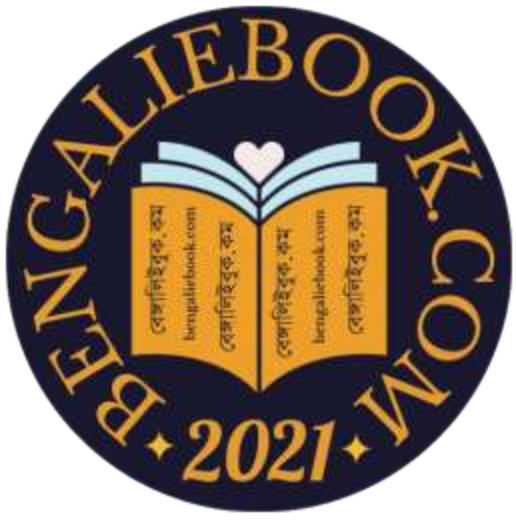

দ্রৌপদী

(প্রথম প্রস্তাব)

কি প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী–ইনিই আর্য্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ-সীতার অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতেছি না–কিন্তু সীতানুবর্ত্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। আজিও যিনি সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যা প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন।

ইহার কারণও দুরনুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্য্যস্ত্রীগণের এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত।

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন; কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে, পতি এক হৌক, পাঁচ হৌক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং গুরুজনের বাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী

কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণগুলিন পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণসকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্য বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

দ্রৌপদীচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ; কেন না, মহাভারত অনন্ত সাগরতুল্য, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ কে করিতে পারে! তথাপি দুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। দ্রুপদরাজার পণ যে, যে সেই দুর্বেধনীয় লক্ষ্য বিঁধিবে, সেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, ঋষিগণ সমবেত। এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারীকুসুম শুকাইয়া উঠে; সেই বিশোষ্যমানা কুমারী লাভার্থ দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীরসকল লক্ষ্য বিঁধিতে যত্ন করিতেছেন। একে একে সকলেই বিন্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা যায় না—কেন না, এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিন্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীর্য্য, তাঁহার প্রধান নায়ক অর্জ্জুনের বীর্য্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অর্জ্জুনহস্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জ্জুনের গৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অর্জ্জুনের গৌরব কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্র কবিকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন যে, তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই– কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয়, তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল রাজাই যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী

লোভে লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে লক্ষ্যবিন্ধনে উত্থিত করিলেন, কর্ণের বীর্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, এবং সেই অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্য্যোধনের সভাতলে দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ডপ্রতাপসমন্বিতা মহাসভায় কুমারীকুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষয় সভাতলে রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদরাজতুল্য পিতার, ধৃষ্টদ্যুম্নতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিন্ধনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল, শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না—দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ব্বিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজদুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।

ইহার পর দ্যূতক্রীড়ায় বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ব্বিত, তেজস্বী, এবং বলধারী ভীমার্জ্জুন দ্যূতমুখে বিসর্জ্জিত হইয়াও কোন কথা কহেন নাই, শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তাঁহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্ত্তব্য? স্বামিকর্ত্তৃক দ্যূতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্য্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দ্যূতবার্ত্তা এবং দুর্য্যোধনের সভায় তাঁহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন, "হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে, কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন

করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমনপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব |” দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, দাসত্ব স্বীকার করিবেন না।

দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট–এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, ধর্ম্মের কিছু, বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন; ভীমসেনে, অর্জ্জুনে, অশ্বত্থামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায়, এবং অর্জ্জুনে ও অশ্বত্থামায় অর্দ্ধমাত্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জ্জুনে এবং অভিমন্যুতে ইহা আত্মশক্তি নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা বলবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল; দ্রৌপদীতে ইহা ধর্ম্মবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে।

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন, “যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না|” স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বসমীপে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, “ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে |” ভীষ্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “বুঝিলাম–দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই |” কিন্তু অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে! মহাভারতের কবি, মনুষ্যচরিত্র-সাগরের তল পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিল, দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না–ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, “হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দু:খনাশ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি–আমাকে উদ্ধার কর!” এস্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ।

দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও অসামান্য–যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মানুরাগিণী

আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুরাগই, প্রবলতার দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ। এই অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণ কালে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই স্থানটি এত সুন্দর যে, যিনি তাহা শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখী হইবেন না। এজন্য সেই স্থানটি উদ্ধৃত করিলাম।

হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়; কেন না, প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষনুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু, বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন | ”

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্ব্বের সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ। যখন জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই তেজোগর্ব্ব বচনপরম্পরা পাঠে মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভীমার্জ্জুনের পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধুসৌবীরাধিপতি ভূতলে পাতিত হয়েন।

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ব্বার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন; দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীরনারীর কার্য্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চিৎকার কিছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী স্বামিগণের উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা করিলেন না; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ব্বিত বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

দশ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদী-চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। অন্যান্য আর্য্যনারী-চরিত্র হইতে দ্রৌপদীর-চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথাসাধ্য দেখান গিয়াছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ত্ব, তাহার কোন কথা সে সময় বলা হয় নাই। বলিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয়, সে কথাটা বলা যাইতে পারে।

সে তত্ত্বটার বহির্বিকাশ বড় দীপ্তিমান্—এক নারীর পঞ্চ স্বামী অথচ তাঁহাকে কুলটা বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য কোথা হইতে হইল?

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়েরা বর্ব্বর জাতি—তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ পদ্ধতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চ পাণ্ডবের একই পত্নী। ইউরোপীয় আচার্য্যবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলো বলিতে বড় মজবুত।

ইউরোপীয়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছু হইতে পারে না; আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালি তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগের সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নূতন নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের তুলনায় উইলো, কি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গা সিন্ধু গোদাবরীর তুলনায় গ্রীক কবিদিগের প্রিয় পার্ব্বতী নির্ঝরিণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য সেইরূপ গ্রন্থ। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, গৃহ্যসূত্র, শ্রৌতসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, দর্শন, এই সকলের ভাষ্য, তার টীকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত জ্যোতিষ, অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরণীয় প্রাচীন তত্ত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে এমন কথা নাই যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একা দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাচীন

ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন পণ্ডিত (Fergusson সাহেব) ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না—সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাসুরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই বলিতেছিলাম—এই সকল পণ্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবার স্থূল তাৎপর্য্য কি, এ কথার মীমাংসা করিবার আগে বিচার করিতে হয় যে, এ কথাটা আদৌ ঐতিহাসিক, না কেবল কবিকল্পনা মাত্র? সত্য সত্যই দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল, না কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন? মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝাইয়াছি। কিন্তু মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই ঐতিহাসিক, ইহা সিদ্ধ হয় না। যাহা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, তাহা ঐতিহাসিক নহে—এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দ্রৌপদী-চরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না—দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত! তাহা হউক—কিন্তু মৌলিক মহাভারতের যত কথা আছে, সকলই যে ঐতিহাসিক এবং সত্য, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ। যে সময়ে কবিই ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাসবেত্তাও কবি, সে সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ। সত্য কথাকে কবির স্বকপোলককল্পিত ব্যাপারে রঞ্জিত করা বিচিত্র নহে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন, ইহা না হয় ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করা গেল—তিনি যে পঞ্চ পাণ্ডবের মহিষী, ইহাও কি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

এই দ্রৌপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমুদ্র মধ্যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীগণের বহুবিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য বিবাহ করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পতির ভার্য্যা ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা গিয়েছে যে, কোন মনুষ্যের প্রতি হস্তে ছয়টি করিয়া দুই হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্য চক্ষুহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মনুষ্যজাতির

হাতের আঙ্গুল বারটি, অথবা মনুষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে। তেমনি কেবলি দ্রৌপদীর বহুবিবাহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, পূর্ব্বে আর্য্যনারীগণ–মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর মহাভারতেই প্রকাশ যে, এরূপ প্রথা ছিল না; কেন না, দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মহাভারতকার পূর্ব্বজন্মঘটিত নানাবিধ অসম্ভব রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদৃশ সমাজে অত্যন্ত লোকনিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাণ্ডবদিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কবির এমন একটা কথা, তত্ত্ববিশেষকে পরিস্ফুট করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে।

গড়া কথার মত, অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর ঔরসে পঞ্চ পুত্র ছিল। কাহারও ঔরসে দুইটি, কি তিনটি হইল না। কাহারও ঔরসে কন্যা হইল না। কাহারও ঔরস নিস্ফল গেল না। সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। কেহই বাঁচিয়া রহিল না। সকলেই এক সময়ে অশ্বত্থামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্য্যকারিতা নাই। সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহন, কেমন জীবন্ত।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চ বিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি দ্রৌপদী একা যুধিষ্ঠিরের ভার্য্যা ছিলেন, তবে কি আর চারি পাণ্ডব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার উত্তর কঠিন বটে।

ভীম ও অর্জ্জুনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহা আমরা জানি। কিন্তু নকুল সহদেবের অন্য বিবাহ ছিল, এমন কথা মহাভারতে পাই না। পাই না বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাঁহাদের অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন পাণ্ডবের অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের জীবনী; অন্য দুই পাণ্ডব তাঁহাদের ছায়া মাত্র–কেবল তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করে। তাঁহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে সেটা প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন। কথাটা তাদৃশ মারাত্মক নহে।

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হওয়ার পক্ষে আমরা উপরে যে আপত্তি দেখাইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর।

এখন, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ কবিরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কবি কি অভিপ্রায়ে এমন বিস্ময়কারী কল্পনার অনুবর্ত্তী হইলেন? বিশেষ কোন গূঢ় অভিপ্রায় না থাকিলে এমন কুটিল পথে যাইবেন কেন? তাঁহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যদি ইংরেজদিগের মত বলেন, "Tut! clear case of polyandry!" তবে সব ফুরাইল। আর তা যদি না বলেন, তবে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সেই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাস্পদ লোকের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিব। কথাটা প্রচারে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্রকে" লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে–

"শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারতপ্রণয়নের পূর্বকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটি অতিমানুষ ঐশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই মহাভারতগ্রন্থেও যে সেই বোধের একটি অপূর্ব্ব প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; বস্তুত– তাহাই সম্ভবপর। তবে আমাদের বোধ হয়, মহাভারতরচয়িতা কর্ম্মকাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রভৃতি তাঁহার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্জ্জুন এবং ভদ্রাকে আদর্শ নর-নারী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরে অচল ভক্তি এবং তজ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল, তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণে একটি বিশেষ ঐশী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে ঐশী শক্তিটি কোন পার্থিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি কর্ত্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কবি বাল্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই–মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং তাহা যতদূর সম্পন্ন হইতে পারে, ততদূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ ঐশী শক্তির নাম 'নির্লিপ্ততা'। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী 'নির্লেপ'।" *

এই "নির্লেপ" বৈরাগ্য নহে অথবা সাধারণে যাহাকে "বৈরাগ্য" বলে, তাহা নহে। আমি ইহার মর্ম্ম যতদূর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইতেছি।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি‖

আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের) বিষয় সকল উপভোগ করিয়া সংযতাত্মা পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

———

*এডুকেশন গেজেট, ১৮ বৈশাখ ১২৯৩।

———

অতএব নির্লিপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বর্জ্জন নিষ্প্রয়োজন। এবং বর্জ্জনে সংলেপই বুঝায়। বর্জ্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে, ইন্দ্রিয়ে এখন আত্মা লিপ্ত আছে—বর্জ্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগশূন্য, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বিজিত করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নির্লিপ্ত। তাঁহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও দুঃখের অতীত।

এইরূপ "নির্লেপ" বা "অনাসঙ্গ" পরিস্ফুট করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন—নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্ত্তী পুরাণকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যবর্ত্তী করিয়াছেন। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের সাধন প্রণালীতে এত বেশী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর আবির্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সেই নির্লিপ্ত । দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপিণী। তৎস্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য। তাই গণিকার ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসর্গযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতিব্রতের পরাকাষ্ঠা। পঞ্চ পতি দ্রৌপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু, এবং ধর্ম্মাচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ্য। যেমন প্রকৃত ধর্ম্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র—ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট এক মাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পঞ্চ স্বামী অনাসঙ্গযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট

এক মাত্র ধর্ম্মাচরণের স্থল। তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই; তিনি গৃহকর্ম্মে নিষ্কাম, নিশ্চল, নির্লিপ্ত, হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহাই দ্রৌপদী-চরিত্রে অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য। তবে ঈদৃশ ধর্ম্ম অতিদুঃসাধনীয়। মহাভারতকার মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় কথিত হইয়াছে যে, দ্রৌপদীর অর্জ্জুনের দিকে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল বলিয়া তিনি সেই পাপফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন না—সর্ব্বাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন।

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায় যে, দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন? হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম; গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম্ম। পুত্র উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে, ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্ম্মার্থে নিষ্প্রয়োজনীয়—কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফল মাত্র। কিন্তু দ্রৌপদী ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত; ধর্ম্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, স্বামিগণের সঙ্গে তাঁহার ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। স্বামীর ধর্ম্মার্থ দ্রৌপদী সকল স্বামীর ঔরসে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন; তৎপরে নির্লেপবশতঃ আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য্য।

এই সকল কথার তাৎপর্য্য বোধ করি, কেহই এমন বুঝিবেন না যে, যে স্ত্রীলোক অনাসঙ্গ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনুষ্যকে স্বামিত্বে বরণ করিবে—তাহা নহিলে ধর্ম্মের সাধন হইবে না। তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্রৌপদীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছিল বলিয়া, তিনি সেই মহাপাপকেও ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন।

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, দ্রৌপদী ধর্ম্মবলে অত্যন্ত দৃপ্তা; সে দর্প কখন কখন ধর্ম্মকেও অতিক্রম করে। সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়জয়ের কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে স্বতন্ত্র কথা।